জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী
ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উপলক্ষে বিশেষ ফিচার

শতবর্ষে আরও উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু

ড. হারুন রশীদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী বাঙালির জন্য অনন্য এক প্রাপ্তি। তিনি এমন এক নেতা যিনি বাঙালিকে দিয়েছেন একটি দেশ, পতাকা ও মানচিত্র। একটি সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। তাই তো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। কবির ভাষায় ‘পুরুষোত্তম তুমি, জাতির পিতা’। যতই দিন যাচ্ছে বাঙালির কাছে বঙ্গবন্ধুর অপরিহার্যতা আরো বাড়ছে। শতবর্ষে আরও উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীনতার স্থপতি। তার অসাধারণ নেতৃত্বের গুণে তিনি কেবল বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবেই পরিগণিত হননি, নিজেকে তিনি নেতৃত্বের এমন এক সুমহান স্তরে সমাসীন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে একাত্তরে অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নাম বলতে বলতেই দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন।

একাত্তরের ২৫ মার্চের কাল রাত্রিতে পাকবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে কারাবন্দি করে। কিন্তু কী আশ্চর্য! বন্দি মুজিব আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। রণাঙ্গণে প্রতিজন যোদ্ধাই হয়ে উঠলেন এক একজন মুজিব। তাঁর নামেই পরিচালিত হলো মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অবশেষে বাঙালি পেল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতার জন্য বাহান্ন’র ভাষা আন্দোলন, ’৬৬ এর ৬ দফা, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে ধীরে ধীরে তৈরি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কারান্তরীণ রাখা হয় বঙ্গবন্ধুকে। কিন্তু তাঁর নামেই পরিচালিত হয় মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালি পায় তার বহুদিনের লালিত স্বপ্নের লাল সবুজ পাতাকা আর স্বাধীন দেশের মানচিত্র। অবশেষে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা স্বাধীন দেশের নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর (যার নামে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে) স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তানের অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির অবিসংবাদিত নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে তাকে গ্রেফতার করে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে আটক রাখা হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে নয় মাস যুদ্ধের পর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও ’৭২ এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্যদিয়ে জাতি বিজয়ের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আগমন বাঙালি জাতির জন্য একটি বড়ো প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নেয়ার প্রশ্নে বাঙালি যখন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি- তখন পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশ

প্রত্যাবর্তন করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। ২৯০ দিন পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুযন্ত্রণা শেষে লন্ডন-দিল্লী হয়ে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে ফেরেন বঙ্গবন্ধু।

তেজগাঁও বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি অবতরণ করার পর খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে জনসমুদ্রের ভেতর দিয়ে রেসকোর্স ময়দানে এসে পৌঁছাতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। সেদিনকার রেসকোর্স ময়দান ছিল লোকে লোকারণ্য। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১৭ মিনিট জাতির উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। যা ছিল জাতির জন্য দিকনির্দেশনা। বাংলাদেশের আদর্শগত ভিত্তি কি হবে, রাষ্ট্র কাঠামো কি ধরনের হবে, পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যারা দালালি ও সহযোগিতা করেছে তাদের কি হবে, বাংলাদেশকে বহির্বিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ, মুক্তিবাহিনী, ছাত্র সমাজ, কৃষক, শ্রমিকদের কাজ কি হবে এসব বিষয়সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে নির্দেশনা ছিল ভাষণে। তিনি ডাক দিলেন দেশ গড়ার সংগ্রামে। রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত মন্ত্রমুগ্ধ জনতা দু'হাত তুলে সেই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সেদিন তিনি বলেন, 'আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম ভাই হিসেবে, নেতা হিসেবে নয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই, এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি আমার বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এই স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না। যদি এ দেশের মা- বোনেরা ইজ্জত ও কাপড় না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণতা হবে না যদি এ দেশের মানুষ, যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।'

১৯৬৭ সালের ১৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারের রোজনামচায় লিখেছিলেন, 'আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করি নাই, বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটা উপহার দিয়ে থাকত। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধ হয়, আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিবস! দেখে হাসলাম।' এই হলেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতার অকৃত্রিমতা।

শোষক ও স্বেচ্ছাচারী শসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির শৃঙ্খল থেকে তিনি বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করার ও স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়ন করেছেন। এ মুক্তির সংগ্রামে তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের কথা বলেছেন। সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে তিনি কখনও দূরে সরে যাননি। ভীতি ও অত্যাচারের মুখেও সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকে শোষিত মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। শোষিত মানুষের পক্ষে নির্ভীক অবস্থানের কারণে তিনি কেবল বাংলাদেশ নয়, সারাবিশ্বে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান।

২০২০ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মগ্রহণের শততম বছর পূর্ণ হবে। বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী উদ&যাপনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শেখ রেহানাসহ ১০২ সদস্যের জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এটি অনন্য গৌরবের বিষয় যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে উদ&যাপন করার ঘোষণা দিয়েছে জাতিসংঘের বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক সংস্থা- ইউনেস্কো। গত ২৫ নভেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দফতরে সংস্থার চল্লিশতম সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে মুজিববর্ষ উদ&যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মহান এই নেতার জন্মশতবার্ষিকী বাঙালি জাতিকে দিবে নতুন এক দিশা। দেশাত্মবোধে নুতন করে উদ্‌ধুদ্ধ হবে জাতি। বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ১৭ মার্চ প্রথমবারের ন্যায় এই দিনটি শিশু দিবস হিসেবে সরকারিভাবে পালন করা হয়।

জাতির পিতা জন্মদিনটিকে শিশু দিবস হিসেবে পালন করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তার বিশ্বাস ছিল আজকের শিশুই আগামীদিনের ভবিষ্যত। আগামীতে দেশ গড়ার নেতৃত্ব তাদের হাতেই। শিশুরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, মর্যাদা ও মহিমায় সমৃদ্ধ হোক- এটাই ছিল তার একান্ত চাওয়া।

বর্তমানে দেশের প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৬ কোটিই শিশু। শিশুরা যাতে একটি সুষ্ঠু স্বাভাবিক উপায়ে বেড়ে উঠতে পারে সেটি নিশ্চিত করাটা অত্যন্ত জরুরি। শিশুর নিরাপত্তা

নিশ্চিত করে তাদের আগামীর সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠার সুযোগ করে দিতে হবে। তবেই বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন শিশু দিবস হিসেবে পালন করা সার্থক হবে।

বঙ্গবন্ধুর জীবনী শিশুদের জন্য তো বটেই সবার জন্যই এক শিক্ষণীয় বিষয়। তার অপরিসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার জন্য আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি যেমন আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তেমনি দেশের জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাই বাঙালি জাতি চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করবে। কবির ভাষায়, ‘যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান’।

#

৩১.১২.২০১৯ পিআইডি

ফিচার